بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ আগস্ট, ২০২৫ মোতাবেক ১৫ যহুর, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত জুমুআয় আমি তিনটি বড়ো প্রতিমা ভাঙা সম্পর্কে বলেছিলাম। এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে: একটি অভিযান ছিল হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশহালীর নেতৃত্বে, যা অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মানাত প্রতিমা ভাঙার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) চব্বিশ রমযানে হযরত সা'দ বিন যায়েদকে মানাত প্রতিমা ভাঙার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এটি লোহিত সাগরের উপকূলে কুদাইদ-এর নিকটে মুশাল্লাল নামক স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল। এই কারণেই একে মুশাল্লাল-এর অভিযানও বলা হয়। হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশহালী বিশজন অশ্বারোহীর সাথে রওয়ানা হয়েছিলেন। যখন তিনি সেখানে পৌঁছেন, তখন সেখানে একজন পরিচারকও ছিল। সেই পরিচারক হযরত সা'দকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী চাও? তিনি বলেন, মানাত ধূলিসাৎ করতে চাই। সে বলে, তুমি এবং এই কাজ! অর্থাৎ তোমার দ্বারা এই কাজ সাধিত হওয়া অসম্ভব। হযরত সা'দ সেই মূর্তির দিকে এগিয়ে যান। বর্ণনাকারী একথা বর্ণনা করেছেন; জানা নেই এটি সত্য কিনা, কখনও কখনও রঙ চড়ানোর জন্যও কথা বর্ণনা করা হয়; সেই সময় একটি নগ্ন কালো ও এলোমেলো চুলের মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে আর পরিচারক মূর্তিকে বলে, হে মানাত! তোমার ক্রোধ বর্ষণ করো। হযরত সা'দ বিন আশহালী তাকে অর্থাৎ সেই পাহারাদারকে হত্যা করেন। যদি এই হত্যার বর্ণনা সঠিক হয়, তবে সম্ভবত সেই সেবক মোকাবিলার চেষ্টা করেছিল এবং লড়াইয়ে নিহত হয়েছিল। শুধু অভিশাপ দেবার ফলে হত্যা করা কখনও ইসলামী শিক্ষা নয়, আর এটি সঠিক বলেও মনে হয় না। অধিকন্তু তা মহানবী (সা.)-এর সার্বজনীন শিক্ষারও বিরোধী। যাহোক, এরপর তিনি ও তার সাথিরা প্রতিমার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন এবং তা ভেঙে ফেলেন। অতঃপর তিনি নিজ সঙ্গীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন।

ইবনে হিশাম লিখেছেন, মহানবী (সা.) মানাত প্রতিমা ধূলিসাৎ করার জন্য আবু সুফিয়ান বিন হারবকে পাঠিয়েছিলেন এবং এটাও বলা হয়, এই কাজ হযরত আলী করেছিলেন। তবে ওয়াকদী ও ইবনে সা'দের মতামত অনুযায়ী হযরত সা'দ বিন যায়েদ এটিকে ধূলিসাৎ করেছিলেন এবং বাকি বর্ণনাও যদি ওয়াকদীর হয়, তবে হতে পারে তিনি কিছু বিষয় অতিরিক্ত যোগ করেছেন।

এরপর রয়েছে নাখলা অভিমুখে পরিচালিত হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের অভিযান। এটি অষ্টম হিজরীর পঁচিশ রমযান মোতাবেক জানুয়ারি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল। পঁচিশ রমযানে মহানবী (সা.) ত্রিশ সদস্যের একটি দল হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে নাখলার দিকে পাঠান, যেন সেখানে স্থাপিত কুরাইশের বিখ্যাত মূর্তি উযযাকে ভূপাতিত করা যায়। নাখলা উপত্যকাটি মক্কার পূর্ব দিকে এক দিনের দূরত্বে মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে অবস্থিত। এই নাখলা নামক স্থানে একটি ঘর ছিল যার রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিল বনু শাবান। এরা বনু হাশিমের মিত্র ছিল। সেখানে উযযা ছিল কুরাইশের সবচেয়ে বড়ো মূর্তি। ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এর ঘরটি তিনটি বাবলা গাছ সম্বলিত ছিল। অর্থাৎ চারদিকে বাবলা

গাছ লাগানো ছিল, মাঝখানে ঘরটি ছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, যখন উযযার পরিচারক হযরত খালিদের আগমনের সংবাদ পায়, তখন সে মূর্তির ওপর তরবারি ঝুলিয়ে নিজে পাহাড়ে উঠে যায় এবং কবিতা পড়তে থাকে যার অনুবাদ হলো: হে উযযা! খালিদের ওপর এমন কঠিন আক্রমণ করো যা কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। যুদ্ধের শিরস্ত্রাণ পরিধান করো এবং হাতা গুটিয়ে নাও। হে উযযা! তুমি যদি এই ব্যক্তিকে অর্থাৎ খালিদকে হত্যা না-ও করো, তবে তাকে শীঘ্রই সংঘটিতব্য পাপের জন্য দায়ী করো বা তার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নাও। হযরত খালিদ নাখলায় পৌঁছেই বাবলা গাছগুলো কেটে ফেলেন এবং সেই ঘরটি ধ্বংস করেন যেখানে উযযা প্রতিমাটি স্থাপিত ছিল। এরপর মক্কায় ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি সেখানে কোনো বিশেষ জিনিস দেখেছিলে? হযরত খালিদ না-সূচক উত্তর দেন। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে তো তুমি উযযাকে শেষ করো নি। ফিরে যাও এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিį করে এসো। এই আদেশ শুনতেই হযরত খালিদ আদেশ পালনার্থে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যান। যখন পরিচারকরা পুনরায় হযরত খালিদকে দেখতে পায়, তখন তারা পাহাড়ে উঠে যায়। তারা বলছিল, হে উযযা! তাদের ধ্বংস করে দাও। সেই মূর্তির ঘর থেকে এলোমেলো চুলে এক কৃষ্ণকায় মহিলা বেরিয়ে আসে; [সেখানেও হয়ত তারা মহিলাদের রেখেছিল;] এবং হযরত খালিদ সেই সময় এই কবিতা পড়ছিলেন। কবিতাটি আরবীতে ছিল আর তা হলো:

ياعزى كفرانك لا سبحانك   اني رايت الله قد أهانك

অর্থাৎ, হে উযযা! আমি তোমাকে অস্বীকার করি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি না। আমি দেখেছি, আল্লাহ্ তোমাকে অপমানিত করেছেন। এরপর তিনি ফিরে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন:

نعم. تلك العزى وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا

অর্থাৎ, হ্যাঁ, এ-ই সেই উযযা যে তোমাদের শহরে তার আর কোনো উপাসনা হবার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে।

এরপর সুওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হযরত আমর বিন আস-এর অভিযানের উল্লেখ রয়েছে। এটিও অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে হয়েছিল। উযযা প্রতিমা ধূলিসাৎ করার পরপরই মহানবী (সা.) হযরত আমর বিন আসকে সুওয়া প্রতিমা ধূলিসাৎ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার সাথে কিছু সঙ্গী ছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় নি। সুওয়া ছিল মদীনা থেকে পশ্চিম দিকে সমুদ্রের উপকূলে রুহাত নামক স্থানে বনু হুযাইলের মূর্তি এবং এই স্থানটি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এই মূর্তির আকৃতি ছিল একজন নারীর এবং লোকেরা এটিকে সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি এটিকে প্রদক্ষিণও করত। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিল বনু লাহিয়ান, যারা হুযাইলেরই একটি শাখা গোত্র।

পবিত্র কুরআনে কিছু মূর্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এই মূর্তিরও উল্লেখ রয়েছে। যেমন সূরা নূহে রয়েছে:

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا (সূরা নূহ: ২৪)

অর্থাৎ, আর তারা বলল, তোমরা কখনও তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না এবং ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকেও ত্যাগ করো না।

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে, নূহের জাতিতে যেই মূর্তিগুলো ছিল, সেগুলোই পরে আরবদের মাঝে এসেছিল। ওয়াদ মূর্তিটি কলব গোত্রের ছিল, যারা দুমাতুল

জান্দালে বাস করত। সুওয়া ছিল হুযাইল গোত্রের আর ইয়াগুস ছিল মুরাদ গোত্রের প্রতিমা। তারপর গুতাইফ সেটিকে অবলম্বন করে, যারা সাবা শহরের কাছে জুরফ-এ বসবাস করত। আর ইয়াউক ছিল হামদান গোত্রের এবং নাসর ছিল হিমইয়ার গোত্রের প্রতিমা, যারা যিল কালাআ-র বংশধর ছিল।

মূলত এগুলো সবই কয়েকজন সৎ মানুষের নাম ছিল যারা হযরত নূহের জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন তারা মৃত্যুবরণ করেন, তখন শয়তান তাদের জাতির লোকদের হৃদয়ে এই কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে যে, যেই স্থানগুলোতে তারা বসতো সেখানে মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের নামানুসারে সেগুলোর নাম রাখো। তারা তা-ই করে এবং সেগুলোর উপাসনা করা আরম্ভ হয়। অর্থাৎ সেই লোকদের উপাসনা করা হতো না, কিন্তু যখন তারা মৃত্যুবরণ করে এবং মূল তথ্য বা সত্য হারিয়ে যায় , তখন সেই মূর্তিগুলোর উপাসনা শুরু হয় বা তাদের নামে নমুনা বানিয়ে সেগুলোর পূজা আরম্ভ হয়।

হযরত আমর বিন আস রুহাত নামক স্থানে সুওয়ার কাছে পৌঁছলে সেখানে তিনি সেটির পরিচারককে দেখতে পান। তিনি তাকে বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর আদেশে এই মূর্তি ভাঙতে এসেছেন। সে বলে, তুমি কখনও এটি ভাঙতে সক্ষম হবে না। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দেয়, তোমাকে যেকোনো উপায়ে বাধা দেওয়া হবে। তিনি (রা.) বলেন, তোমাদের জন্য আক্ষেপ! এটি কি শুনতে পায় নাকি দেখতে পায়? এরপর তিনি (রা.) সামনে এগিয়ে সেটি ভেঙে ফেলেন এবং নিজ সাথিদেরকে সেটির সাথে নির্মিত ঘরটিও ভেঙে ফেলার আদেশ দেন আর তারা সেটি ভেঙে ফেলে। এরপর তিনি (রা.) সেটির সেবায়েতকে বলেন, দেখলে তো? সে তার নিজ উপাস্যের এই দশা দেখে তৎক্ষণাৎ বলে, আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করছি এবং ইসলাম গ্রহণ করছি। এভাবে এই সত্যেরও সত্যায়ন হয় যে, পূর্বে খাদেম কিংবা কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা সংক্রান্ত যে কাহিনি রয়েছে– তা অসম্ভব বলে মনে হয়।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র অভিযান পরিচালিত হয় বনু জাযীমা অভিমুখে। এটিও অষ্টম হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ঘটনা। মক্কা বিজয়ের পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যখন উযযা মূর্তি ভেঙে ফেরত আসেন তখন মহানবী (সা.) তাকে বনু জাযীমা অভিমুখে প্রেরণ করেন। এটি বনু কিনানা গোত্রের শাখা ছিল যারা মক্কার 'ইয়ালামলাম'-এর নিকট বসবাস করত। মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, এই গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করো; আর মহানবী (সা.) এটিও বলেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। [এটি সর্বদাই মহানবী (সা.)-এর নীতিগত নির্দেশনা ছিল– সর্বদা স্মরণ রাখবে যে, যুদ্ধ করা যাবে না।] হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) মুহাজির, আনসার ও বনু সুলাইম গোত্রের তিনশত সদস্যসহ যাত্রা শুরু করেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যখন সেখানে পৌঁছান তখন তিনি দেখেন, মানুষ এমনভাবে সশস্ত্র যেন তারা হামলা করবে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) মানুষজনকে বলেন, অস্ত্র সমর্পণ করো, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। খালিদের কথা শুনে তাদের মাঝ থেকে হাজদাম নামের এক ব্যক্তি দাঁড়ায় এবং নিজ জাতিকে সম্বোধন করে বলে, হে বনু জাযীমা! অস্ত্র সমর্পণ কোরো না। এ হলো খালিদ; অস্ত্র সমর্পণের পর তোমাদেরকে গ্রেফতার কিংবা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। এ কারণে আমি অস্ত্র সমর্পণ করব না। এতে অন্যরা হাজদামকে বুঝায়, কেন তুমি আমাদের হত্যা করাতে উঠেপড়ে লেগেছ? অস্ত্র সমর্পণ করো। লোকজন তাকে বুঝাতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তার কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। অস্ত্র সমর্পণ করার পর তাদেরকে আটক করা হয়েছিল বলে বর্ণনায় পাওয়া

যায়। আর প্রত্যেক মুসলমানকে এক-দুইজন করে বন্দি প্রদান করা হয়। পুরো রাত তারা বন্দি অবস্থায় থাকে। যেহেতু তারা অস্ত্রধারণ করেছিল আর তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ছিল না, তাই হয়ত তাদের বন্দি করা হয়েছিল।

যাহোক, এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী যখন হযরত খালিদ সেখানে পৌঁছান আর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন তারা আসলামনা বলার পরিবর্তে 'সাবানা' 'সাবানা' বলা শুরু করে, অর্থাৎ আমরা ধর্ম পরিত্যাগ করলাম, আমরা আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করলাম। এতে হযরত খালিদ ভুল বুঝেন যে, এরা তো মুসলমান নয়। এ কারণে তিনি তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুণ্ডাদেশ জারি করেন। এই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, হযরত খালিদ যখন তাদের কাছে পৌঁছান তখন তিনি মানুষকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন ধর্মের অনুসারী? তারা জবাব দিল, আমরা মুসলমান, আমরা নামায পড়ি ইত্যাদি। হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তাহলে তোমরা অস্ত্র কেন উঁচিয়ে রেখেছ? তারা বলে, আমাদের ও আরবের একটি গোত্রের মাঝে শত্রুতা রয়েছে। আমাদের আশঙ্কা ছিল– আপনারা সম্ভবত সেই শত্রুপক্ষ; এ কারণে অস্ত্র ধারণ করেছি। মনে হয়, এটি দেখে হযরত খালিদ সতর্ক হয়ে যান এবং তার হৃদয়ে তাদের বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ তার সেই সিদ্ধান্তের কোনো যৌক্তিকতা যদি খোঁজা হয়– তাহলে। যাহোক, রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এসব বন্দিরা নামায পড়ত এবং মুসলমান মনে হতো, কিন্তু খুব সম্ভব তাদের মাঝে এমন বন্দিও ছিল যারা হাজদামের মতো এবং তাদের সমমনা ছিল, অর্থাৎ যারা বিদ্রোহ প্রদর্শন করছিল। আর হযরত খালিদ (রা.) তাদের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। আর তাদের মাঝে কতিপয়ের 'সাবানা' 'সাবানা' (অর্থাৎ 'আমরা ধর্ম পরিত্যাগ করেছি', 'আমরা আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি') বলাটা হযরত খালিদ (রা.)-কে সতর্ক করে দেয়। তাই তিনি (রা.) এক রাতের শেষ প্রহরে এই ফতোয়া প্রদান করেন যে, এই যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করাই যথার্থ মনে হচ্ছে। এর ফলে কতিপয় মুসলমান নিজেদের যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করেন। কিন্তু মুহাজির ও আনসারের দল, যারা পুরোনো মুসলমান ছিলেন, তারা খালিদ (রা.)-র সিদ্ধান্তে সহমত পোষণ করেন নি আর নিজেদের বন্দিদের হত্যা করেন নি। আনসারের সর্দার আবু উসায়েদ সায়েদী হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের কাছে যান আর তাকে বলেন, এরা মুসলমান, এদেরকে হত্যা করা ঠিক হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম (রা.)-ও হযরত খালিদের সিদ্ধান্তের প্রতি সহমত পোষণ করেন নি আর নিজেদের অন্যান্য সাথিদেরকেও স্বীয় বন্দিদের হত্যা করতে নিষেধ করেন। সেই বন্দিদের মধ্য থেকে এক মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি মদীনায় এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, খালিদের কথায় কি কেউ মতানৈক্য প্রকাশ করে নি বা (তাকে) বাধা দেয় নি? সে নিবেদন করে, গৌর বর্ণের মাঝারি আকৃতির একজন ব্যক্তি আর দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি ছিলেন, এরা উভয়ে খালিদের সাথে কথা বলেছিলেন। একজন কিছুটা প্রতিবাদী কণ্ঠে কথা বলেন। হযরত উমর (রা.) তখন সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হুযূর! একজন তো আমার পুত্র আব্দুল্লাহ্ ছিল, অর্থাৎ দীর্ঘাকৃতির ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.), আর দ্বিতীয়জন আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম ছিলেন। মহানবী (সা.) পুরো ঘটনা অবহিত হবার পর ভীষণ কষ্ট পান। তিনি (সা.) বলেন, তাদেরকে হত্যা করার জন্য আমি খালিদকে নির্দেশ দেই নি। আমি তো কেবল তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে বলেছিলাম। এরপর মহানবী (সা.) নিজের দুই হাত ওঠান আর দুইবার খোদার সমীপে

নিবেদন করেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِد (আল্লাহুম্মা ইন্নী আবরাউ ইলাইকা মিম্মা সানাআ' খালিদ) অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! খালিদ যা কিছু করেছে আমি তা থেকে তোমার সমীপে দায়মুক্তির মিনতি করছি। অনুরূপভাবে তিনি (সা.) খালিদ বিন ওয়ালীদের প্রতিও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন যে, এত ত্বরাপরায়ণতা কেন প্রদর্শন করা হলো? ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা উচিত ছিল। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে 'বনু জাযীমা' অভিমুখে তাদের নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ আদায় এবং পুরো ঘটনা তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রা.) সেখানে গিয়ে সকল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রক্তপণ প্রদান করেন আর তাদের যেসব সম্পদ মুসলমানরা নিয়েছিল সেগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। এমনকি কাঠের সেই পাত্রও ফিরিয়ে দেন, যে পাত্রে কুকুর পানি পান করত। সবাইকে রক্তপণ প্রভৃতি পরিশোধের পর হযরত আলী (রা.)-র কাছে কিছু সম্পদ উদ্‌বৃত্ত থাকলে তিনি বনু জাযীমার লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, এমন কেউ কি আর আছে যার কোনো ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় নি? সবাই বলল, না। এরপর হযরত আলী (রা.) অবশিষ্ট সেই সম্পদও তাদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আর তিনি (রা.) বলেন, আমি এই সম্পদ রসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাবধানতাবশত প্রদান করছি যেন সেই অজানা ক্ষতিরও মোচন হয়ে যায়, যা আল্লাহ্‌র রসূলও জানেন না আর তোমরাও জানো না। হযরত আলী (রা.) ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে সমস্ত রিপোর্ট প্রদান করেন। আর এটিও বলেন যে, তাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুও তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উদ্‌বৃত্ত সম্পদও তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা.) এটি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন আর হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, اصبت واحسنت (আসাবতা ও আহসানতা) অর্থাৎ, তুমি সঠিক আর খুবই ভালো কাজ করেছ। এই ঘটনার পূর্বে মহানবী (সা.) একটি স্বপ্নও দেখেছিলেন যা 'সীরাত ইবনে হিশাম'-এ উল্লেখ আছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি 'হেয়স' (খেজুর, পনির ও ঘি দিয়ে তৈরি এক প্রকার খাবার) থেকে এক লোকমা মুখে নিলে এর স্বাদ খুবই চমৎকার লাগে; কিন্তু আমি যখন তা গলাধঃকরণ করি তখন এর কিছু অংশ আমার গলায় আটকে যায়। এরপর আলী হাত ঢুকিয়ে তা বের করে নিয়ে আসে।

হযরত আবু বকর (রা.) এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি আপনার প্রেরিত অভিযানগুলোর একটি, যা আপনি (ভবিষ্যতে) প্রেরণ করবেন। এর কিছু দিক আপনার পছন্দ হবে এবং কিছু অপছন্দনীয় হবে। অতঃপর আপনি আলী (রা.)-কে পাঠাবেন এবং তিনি তা সহজ করবেন, অর্থাৎ বিষয়টির সঠিক সমাধান দেবেন। অতএব এ অভিযানের মাধ্যমে এই স্বপ্নটি পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বুখারীর একজন ব্যাখ্যাকার হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব, যিনি জামা'তের একজন সুপরিচিত বুযুর্গ, তিনি বুখারীর ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেছেন; এই পুরো ঘটনা ও বর্ণনাসমূহ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি লেখেন:

তাবাকাত ইবনে সা'দ এবং সীরাত ইবনে হিশাম উভয় গ্রন্থে এই অভিযানের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) বিভিন্ন অঞ্চলে সেনাদল পাঠিয়েছিলেন, যেন বিভিন্ন গোত্র ইসলাম সম্পর্কে কতটা আগ্রহ রাখে তা বুঝা যায়। [ইসলামের প্রতি আগ্রহ বুঝতে; জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে নয়।] মহানবী (সা.) এ উদ্দেশ্যেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে বনু জাযীমা-র কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তাবাকাত ইবনে সা'দ-এ স্পষ্টভাবে এ শব্দগুলো উল্লেখ আছে,

بَعَثَهٗ اِلٰی بَنِیْ جَزِیْمَةِ دَاعِیًا اِلَی الْاِسْلَامِ وَلَمْ یَبْعَثْهُ مُقَاتِلًا

অর্থাৎ, মহানবী (সা.) ৩৫০জন মুহাজির এবং আনসার সমন্বয়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে বনু কিনানা-র গোত্র বনু জাযীমা-র নিকট প্রেরণ করেছিলেন, যা মক্কার নিকটবর্তী ইয়ালামলাম অঞ্চলে বসবাসরত ছিল। তাদেরকে সেখানে যুদ্ধ করার জন্য নয়, বরং ইসলামের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। এ গোত্রটি ইসলামের প্রতি অনুরাগী ছিল। এ অভিযান ইয়াওমুল কুমায়সা নামেও পরিচিত। কুমায়সা অর্থ হলো ঝরনা থেকে বের হওয়া পানি। এটি মক্কার নিকটবর্তী এক মরুভূমি অঞ্চল ছিল যেখানে বনু জাযীমা বসবাস করত। এই রেওয়ায়েতের রাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর স্বয়ং এ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। তার বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত। ইবনে ইসহাক এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, বনু জাযীমার একটি নির্দিষ্ট অংশ ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, এছাড়া অধিকাংশই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের অস্বীকারকারীরা সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ করে, যে কারণে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ তাদের মোকাবিলা করেন এবং পরাজয় বরণের পর তাদেরকে বন্দি করা হয়। তাদের মাঝে কতক নিজেদের অবরুদ্ধ দেখে ‘সাবানা সাবানা’ বলে ইসলাম গ্রহণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ‘সাবানা’ শব্দের অর্থ আমরা সাবী হয়ে গিয়েছি, অর্থাৎ নিজেদের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলেছি। মহানবী (সা.)-কে মক্কায় ব্যঙ্গ করে সাবী নামে ডাকা হতো আর মানুষের মাঝে এই শব্দের প্রতি এভাবে ঘৃণা সৃষ্টি করা হতো যে, তিনি (সা.) নিজ ধর্ম পরিবর্তন করেছেন। যাহোক, লড়াইকারীরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয় নি, বরং তারা ‘সাবানা’ শব্দ ব্যবহার করতে লাগল। এই শব্দাবলির মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল, কিন্তু বাঁচতে পারল না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র নির্দেশে বন্দিদের হত্যা করেন নি। তিনি যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এ ঘটনার উল্লেখ করেন তখন তিনি (সা.) হাত ওঠান এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র প্রতি বীতশ্রদ্ধতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সা’দ-এর বর্ণনামতে ইসলামী সৈন্যদের মাঝে বনু সুলাইম এবং মুদলিজ গোত্রের কিছু যোদ্ধাও ছিলেন, যারা বনু জাযীমার মতো বনু কিনানার শাখা ছিল আর পূর্বের কোনো এক যুদ্ধে বনু জাযীমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। বনু জাযীমা যখন বনু সুলাইম এবং মুদলিজকে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সাথে দেখল, তখন তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রধারণ করল। হযরত খালিদ তাদেরকে বললেন, লোকেরা মুসলমান হয়ে গিয়েছে, তারপরও যুদ্ধ কেন? অস্ত্র সমর্পণ করো। অর্থাৎ পূর্বে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে। হাজদাম নামক একজন সর্দার তাদেরকে পরামর্শ দিল, অস্ত্র সমর্পণ কোরো না, অন্যথায় নিহত ও বন্দি হবে। জাতির অন্য লোকেরা তাকে বাধা দেয় এবং বলে, রক্তপাত কেন ঘটাচ্ছো? লোকেরা তো মুসলমান হয়ে গেছে। ইবনে হিশামের রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, বনু কিনানার গোত্রসমূহের মধ্যে কিছু রক্তপাতের প্রতিশোধ নেবার প্রশ্নও ছিল যার কারণে তারা লড়াই করেছে, মৃত্যুবরণ করেছে এবং বন্দিও হয়েছে। মনে হয়, বনু সুলাইমের যোদ্ধারা হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে নিজেদের কতিপয় বন্দিকে তাদের পূর্বের অপরাধের কারণে হত্যা করে আর তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণাকে কপটতা গণ্য করে; কিন্তু মুহাজির এবং আনসার হযরত খালিদের এই ফতোয়া মান্য করেন নি এবং নিজেদের বন্দিদেরকে ওপরে বর্ণিত ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা অনুযায়ী মুক্ত করে দেন। তারা তাদেরকে

হত্যা করার পরিবর্তে মুক্ত করে দেন। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা স্পষ্ট। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াত থেকেও এ কথা স্পষ্ট যে, বন্দিদের হত্যার বিষয়টি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের কোনো নির্দেশ ছিল না, বরং তার একটি ফতোয়া ছিল, যার সাথে বেশিরভাগ সাহাবীই সহমত পোষণ করেন নি। যদি সেটি নির্দেশ হতো তাহলে সবাই তা মেনে নিতেন আর কেউ তার সাথে মতবিরোধ করতেন না। কিন্তু ফতোয়া দেবার ক্ষেত্রে হযরত খালিদ (রা.)-র কিছু বিষয়ে ভুল হয়েছে এবং মহানবী (সা.) হযরত খালিদের উল্লিখিত এই ভুলের কারণে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছেন। মহানবী (সা.) সেই ভুল সংশোধনের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে প্রেরণ করেন, যিনি সেখানে গিয়ে এক একটি বাচ্চার রক্তপণ আদায় করেন; এমনকি যাদের কোনো কুকুরও মারা গিয়েছে– তাদের সেই কুকুরগুলোরও রক্তপণ আদায় করেন। [সীরাতে ইবনে হিশামে এই কথা লেখা আছে।] এছাড়া তাদেরকে তাদের প্রাপ্য রক্তপণের চেয়ে অধিক অর্থও প্রদান করেন। ইমাম বাকেরও হযরত আলী (রা.)-র মাধ্যমে প্রদানকৃত ক্ষতিপূরণের উল্লেখ করে বলেন, 'হযরত খালিদ তাদেরকে হত্যা এবং বন্দি করা আরম্ভ করেন'– এর অর্থ এটি নয় যে, তিনি তাদের আত্মসমর্পণের পরেও তাদেরকে হত্যা করেছেন। ইবনে সা'দ এ সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোর মধ্যে একটি বর্ণনা ইবনে ইসহাকের বরাতে হযরত ইবনে আবি হাদরাদ আসলামীর, তিনি এই সেনাদলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, কতক ব্যক্তি যুদ্ধ করেছে; আর এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, বনু জাযীমাকে অস্ত্রে সুসজ্জিত দেখে হযরত খালিদ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, 'মা বালুস্ সিলাহে আলাইকুম' অর্থাৎ তোমরা অস্ত্রধারণ করে রেখেছ কেন? তারা বলল, আমাদের মাঝে এবং কতক আরব গোত্রের মাঝে পুরোনো শত্রুতা রয়েছে, সুতরাং আমরা এ বিষয়ে ভীত ছিলাম যে, তোমরাই সেসব লোক আর এজন্যই আমরা অস্ত্রধারণ করেছি। হযরত খালিদ তাদেরকে বন্দি করার নির্দেশ দিলেন। তাদের হাত বেঁধে তাদেরকে নিজের সঙ্গীদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

ইমাম ইবনে হাজর এই উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে লেখেন, লড়াইকারীরা লড়াইয়ের পর নিজেরা আত্মসমর্পণ করে। ইমাম বুখারীর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। আর কিতাবুল মাগাযীর বর্ণনায় যে ঘটনাসমূহ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোতেও পরিষ্কার কোনো যোগসূত্র দেখা যায় না। যাহোক, সংক্ষিপ্তভাবে এটিই জানা যায়, যে লড়াই এই তবলীগী অভিযানে সংঘটিত হয়েছিল তাতে অজ্ঞতার যুগের কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কারণ বিদ্যমান ছিল। শুধুমাত্র 'সাবানা' শব্দটির ক্ষেত্রে মতবিরোধের জের ধরে কতক বন্দিকে হত্যা করার বিষয়টি অযৌক্তিক; বিশেষ করে যেখানে মুহাজির এবং আনসার প্রকাশ্যভাবে উপরোক্ত ফতোয়ার বিরোধী ছিলেন। খাত্তাবী বলেন, মহানবী (সা.)-এর বাক্য اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِد (আল্লাহুম্মা ইন্নী আবরাউ ইলাইকা মিম্মা সানাআ খালিদ) থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি (সা.) হযরত খালিদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ত্বরাপরায়ণতা এবং 'সাবানা' শব্দটির ক্ষেত্রে বিচারবিশ্লেষণ না করাকে অপছন্দ করেছেন। হযরত খালিদ (রা.)-র উচিত ছিল, 'সাবানা' শব্দটি দিয়ে তারা কী বুঝাতে চেয়েছে তা ভালোভাবে যাচাইবাছাই করা। ইমাম বাকের বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিনি যেন সেই লোকদের কাছে যান এবং অজ্ঞতার বিষয়গুলোকে নিজের পদতলে পিষ্ট করে দেন। সুতরাং তিনি সেখানে যান এবং প্রত্যেকের রক্তপণ আদায় করেন। এই বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, সত্যিই কোনো পুরোনো হিংসাবিদ্বেষ ও প্রতিশোধ এই লড়াইয়ের পেছনে কাজ করছিল,

যেভাবে তিনি (সা.) বলেছেন যে, ‘অতীতের কথাগুলোকে মুছে দাও’। তিনি (সা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোনো পুরোনো বিদ্বেষ তাদের হৃদয়ে ছিল আর সেটিই যুদ্ধ বা লড়াইয়ের হয়েছিল। মহানবী (সা.) যখন কোনো অভিযান প্রেরণ করতেন তখন তাদের এটিই বলতেন যে, যুদ্ধ করার বিষয়ে যেন তাড়াহুড়ো করা না হয়, বরং ধীরতা ও নম্রতা প্রদর্শন করা হয় আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্বে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো হয়, এর বিধিবিধান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়– যেন সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আর যেখান থেকে আযানের ধ্বনি শোনা যাবে সেখানে যেন আক্রমণ করা না হয়। উপরোক্ত ঘটনায় স্বয়ং বনু জাযীমা গোত্রের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পাঠানো হয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত অভিযান সুস্পষ্টভাবে এ কারণে প্রেরণ করা হয় যে, এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামের দিকে আহ্বান করা, যুদ্ধ করা নয়। তাবাকাত ইবনে সা’দ-এ যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ বনু জাযীমার নিকট পৌঁছেন তখন তিনি (রা.) তাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা কারা? তারা বলে আমরা মুসলমান, আমরা নামায পড়ি এবং মহানবী (সা.)-কে সত্যবাদী হিসাবে মান্য করি, নিজেদের আঙিনায় মসজিদ বানিয়েছি আর তাতে আযান দিয়েছি। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে হাতে অস্ত্র কেন? তারা বলে, আমাদের এবং অন্য একটি আরব গোত্রের মাঝে শত্রুতা রয়েছে। আমাদের আশঙ্কা ছিল, তোমরাই আবার তারা নয়ত! উপরোক্ত ব্যাখ্যার পর তাদের সাথে কোনোভাবেই যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না। মনে হয়, ইয়ালামলামের একপাশে বসবাসের কারণে পূর্ববর্তী শত্রুতার স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হয়, যার কারণে একটি দলের সাথে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল আর এরপর যুদ্ধংদেহী সৈন্যরা ‘সাবানা’ বলে ইসলামের ঘোষণা দিলেও তাদের শেষ রক্ষা হয় নি এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সেনাবাহিনীর নেতা হবার কারণে ভর্ৎসনার শিকার হয়েছিলেন। ইবনে হিশাম হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফের মতবিরোধ ও পরস্পর অসন্তুষ্টিরও উল্লেখ করেছেন যা তখন দুইজনের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) তাকে বলেন, عملت بأمر الجاهلية في الإسلام (আমিলতা বিআমরিল জাহিলিয়্যাতি ফিল ইসলাম) অর্থাৎ, আপনি ইসলামে অজ্ঞতার ন্যায় কাজ করেছেন। তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তাকে উত্তরে বলেন, إنما ثأرت بأبيك (ইন্নামা সাআরতা বিআবিকা)– তুমি আমাকে এটি বলে তোমার পিতার প্রতিশোধ নিয়েছ। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, এটি সঠিক নয়, কেননা আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছি, কিন্তু আপনি আপনার চাচা ফাকেহ বিন মুগীরার প্রতিশোধ নিয়েছেন। এই নিয়ে বাগবিতণ্ডায় তারা একে অপরের প্রতি ক্ষুব্ধ হন, এমনকি মহানবী (সা.) যখন এই অসন্তুষ্টির কথা জানতে পারেন তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে বলেন, আমার সাহাবীদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ কোরো না। খোদার কসম! যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও তোমরা পেয়ে যেতে আর তা আল্লাহ্ তা’লার পথে ব্যয় করতে– তবুও আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে কারো সমতুল্য মর্যাদা পেতে না, যা তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্ তা’লার স্মরণে লাভ করে থাকেন। [কেননা এরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাহাবী ছিলেন।] সীরাত ইবনে হিশামে ইবনে ইসহাকের এই বর্ণনাও পাওয়া যায় আর সেখানে বর্ণিত হয়েছে, ফাকেহ বিন মুগীরা মাখযুমী, অওফ বিন আব্দে অওফ যুহরী এবং আফফান বিন আবিল আস ইয়েমেন অভিমুখে ব্যবসায়িক কাজে গিয়েছিলেন আর ফিরতি পথে ইয়েমেনে মৃত্যুবরণকারী একজন জাযীমী ব্যক্তির সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের দেবার জন্য নিয়ে আসেন। বনু জাযীমা গোত্রের

এক ব্যক্তি খালিদ বিন হিশামের সাথে পথিমধ্যে তাদের সাক্ষাৎ হয় আর যখন সে জাযীমা গোত্রের সেই ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারে তখন সে বলে, সে-ই এই সম্পদের উত্তরাধিকারী। তারা উপরোক্ত সম্পদ দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের মধ্যে লড়াই হয় আর লড়াইয়ে অওফ বিন আব্দে অওফ ও ফাকেহ বিন মুগীরা দুইজনই মৃত্যুবরণ করেন এবং আফফান বিন আবিল আস ও তার ছেলে উসমান বেঁচে যান আর তারা ফাকেহ বিন মুগীরা ও অওফ বিন আব্দে অওফের সম্পদ নিয়ে নেন। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন অওফ সুযোগ বুঝে খালিদ বিন হিশামকে হত্যা করে নিজ পিতা অওফকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। কুরাইশও এই ঘটনার কারণে ক্রোধান্বিত ছিল এবং বনু জাযীমা গোত্রের ওপর আক্রমণ করে নিজেদের নিহতদের ও সম্পদের ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল। তখন বনু জাযীমা বলে, তোমাদের লোকদের হত্যাকাণ্ড (আমাদের) এক ব্যক্তির একক ঘটনা ছিল, এতে আমাদের কোনো হস্তক্ষেপ ছিল না এবং এ ব্যাপারে আমরা অবগতও ছিলাম না। আমরা নিহতদের এবং সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবো। কুরাইশ তাদের ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রস্তাব মেনে নেয়, যা সীরাত ইবনে হিশামে বর্ণিত হয়েছে।

যাহোক, এসব ঘটনা কিছু বিষয়ের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে যে, কেন শত্রুতা ছিল। শত্রুতার কারণ হিসাবে এই ঘটনাটিও লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এটি সেই ঘটনার একটি প্রেক্ষাপট যার কারণে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) আপত্তির মুখে পড়েছেন এবং সাহাবীরাও এই কারণেই হযরত খালিদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। যাহোক, হযরত খালিদের এহেন কাজের পক্ষে কোনো অজুহাত দাঁড় করানো যায় না। কেননা তিনি শুধুমাত্র ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, যেক্ষেত্রে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ বৈধ ছিল না। সাহাবীদের অধিকাংশই তাকে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন যা গৃহীত হয় নি। আর বনু সুলাইম এক রাতের মধ্যেই নিজেদের বন্দিদের হত্যা করার সুযোগ পেয়ে যায়। ইবনে ইসহাকের একটি রেওয়ায়েতে হযরত খালিদের এই অপারগতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণে লোকদের অস্বীকৃতি দেখে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহমীর (রা.) পরামর্শে তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। এই বিষয়ে ইবনে ইসহাকের বর্ণিত শব্দগুলো হলো: কিছু লোক যারা হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদকে (রা.) এই হত্যাকাণ্ডে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন– তাদের বর্ণনা হলো, আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহমী তাকে বলেছিলেন, যদি তারা ইসলাম থেকে বিরত থাকে তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাকে তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই অজুহাত সঠিক নয়। কেননা আমীর আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহমী ছিলেন না, বরং খালিদ ছিলেন। এই ভুল ইচ্ছাকৃত হোক অথবা ভুল বোঝাবুঝির কারণে হোক, সেনাদলের আমীরই এই ভুলের জন্য দায়ী ছিল। বিশেষত যেক্ষেত্রে মহানবী (সা.) তদন্ত করার পরে খালিদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্টি ও তার কর্ম থেকে দায়মুক্তি প্রকাশ করেছিলেন, সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া উচিত। আর এই ঘটনা কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না যে, মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত প্রদান সত্ত্বেও 'খালিদ ঠিক করেছেন নাকি ভুল করেছেন'– এমন অজুহাত খুঁজতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তুমি ভুল করেছ', সেইসাথে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন– এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদি আমরা অজুহাত খুঁজি তাহলে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে ইসলামের যে নীতিগত শিক্ষা রয়েছে– সেটির ওপর আঘাত আসে। মহানবী (সা.) তো যোদ্ধাদের সাথে লড়াই করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ইসলামের তবলীগের ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের পর আরব গোত্রগুলোতে ইসলামের বার্তা পৌঁছাতে বেশ কিছু সেনাদল প্রেরণ

করেন। আর সেসব দলের আমীরদের সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেন যেন যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া হয়। মাগাযী তথা যুদ্ধের বিবরণ সম্বলিত পুস্তকসমূহে ও ইতিহাসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, এসব দল ইসলামের সংবাদ পৌঁছানোর জন্যই প্রেরিত হয়েছিল। এই বিষয়ে সীরাত ইবনে হিশাম ও তাবাকাত ইবনে সা'দের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লামা তাবারী বিষয়টি এই ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কার আশেপাশে একাধিক সারিয়্যা (তথা অভিযাত্রী দল) প্রেরণ করেন যেন তারা লোকদেরকে প্রতিমাপূজা থেকে বিরত করেন এবং মহা সম্মানিত আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে তাদেরকে আহ্বান জানান। আর এসব অভিযানে যুদ্ধ করার কোনো নির্দেশ প্রদান করেন নি।

বর্তমানে উগ্রপন্থি মৌলভীরা এসব বিষয়কেই দলিল হিসেবে গ্রহণ করে হত্যা করার অথবা যুদ্ধ করার বৈধতা খুঁজে বের করে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সুস্পষ্ট শিক্ষা হলো– যে সরাসরি যুদ্ধ করে না, তার সাথে যুদ্ধ করবে না; আর এটা অপরাধ। ওপরে বর্ণিত ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েত থেকেও বিষয়টির সত্যায়ন হয় যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ইসলামের সংবাদ পৌঁছানোর জন্যই বনু জাযীমার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। فدعاهم إلى الإسلام। (ফাদাআহুম ইলাল ইসলাম)– আর তিনি এই নির্দেশ পালনে ইসলামের বার্তা পৌঁছান। তারা ঠিকভাবে এটা বলতে পারে নি– আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি; ঘাবড়ে গিয়ে বলতে থাকে, 'আমরা আমাদের ধর্ম পরিবর্তন করেছি'। এই কথাটি পুরো গোত্রের বক্তব্য ছিল না, কেননা তাদের অধিকাংশ আগেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। বরং এই বক্তব্য বিশেষ একটি পরিবারের ছিল, যাদের আশঙ্কা ছিল– তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। এজন্য তারা সশস্ত্র হয়ে লড়াই আরম্ভ করে। লড়াইয়ে নিজেদের পরাজয় বুঝতে পেরে 'সাবানা' বাক্য দ্বারা ইসলামের বহিঃপ্রকাশ করে। ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে চূড়ান্ত পর্যায়ের সংক্ষেপণ করা হয়েছে এবং তিনি সেই রেওয়ায়েতটি গ্রহণ করেছেন যা তার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়। হাজদাম নিজের লোকদের পরামর্শ দিয়েছিল যে, অস্ত্র সমর্পণ কোরো না, বরং প্রতিরোধ করো। এথেকেও বুঝা যায়, পূর্ববর্তী রক্তপাতের কারণে তার আশঙ্কা ছিল। ইবনে ইসহাকের প্রথম রেওয়ায়েতে তার এই কথাগুলো উদ্ধৃত হয়েছে যে, হে বনু জাযীমা! স্মরণ রেখো, এ তো খালিদ। অস্ত্র সমর্পণ করার পর বন্দি করা হবে এবং এরপর শিরশ্ছেদ করা হবে। তার গোত্রের কিছু লোক তাকে ধরে ফেলে আর বলে, তুমি রক্তপাত ঘটাতে চাইছ। লোকেরা তো মুসলমান হয়ে গেছে এবং তারা অস্ত্র সমর্পণ করেছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এখন শান্তি। লোকেরা তাকে বুঝাতে থাকে আর তার কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। হযরত খালিদের নির্দেশে বাকিরাও অস্ত্র ফেলে দেয়। সীরাত ইবনে হিশামে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই বিবরণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, হাজদামের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। মনে হয়, সাহাবীরা সেই গোত্রের নওমুসলিমদের ইসলাম শেখানোর উদ্দেশ্যে সেখানে কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন, যেমনটি রেওয়ায়েতে বিদ্যমান 'হাত্তা ইযা কানা ইয়াওমুন আমারা খালিদুন' বাক্য দ্বারা প্রকাশ পায়। আর সেখানে অবস্থানকালে একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, যার দরুন গোত্রের কিছু লোকের সাথে যুদ্ধ হয় এবং তারা পরাজিত হয়ে বন্দি হয়। বন্দিদের যখন মুজাহিদদের হাতে সোপর্দ করা হয়, তখন সম্ভবত কিছু ব্যক্তি অতীতের বিদ্বেষ মেটানোর সুযোগ পেয়ে যায় এবং তাদের হত্যা করে। ইবনে হিশাম এ বিষয়ে ইবরাহীম বিন জাফর মাহমূদীর সূত্রে মহানবী (সা.)-এর স্বপ্ন এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র ব্যাখ্যারও উল্লেখ করেছেন যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি; (স্বপ্নে) তিনি (সা.) খেজুর, ছাতু

এবং ঘি মিশ্রিত খাবার থেকে কয়েক গ্রাস খেয়েছিলেন যা খুবই সুস্বাদু ছিল, কিন্তু শেষের এক গ্রাস গলায় আটকে যায়। তখন হযরত আলী (রা.) হাত দিয়ে তা বের করেন। হযরত আবু বকর (রা.) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এর সম্পর্ক একটি তবলীগী দলের সাথে, আর তিনি পরামর্শ দেন, খালিদের ভুলের সংশোধন করার জন্য যেন হযরত আলী (রা.)-কে পাঠানো হয়। এই স্বপ্ন থেকেও বুঝা যায়, এই ঘটনার সম্পর্ক ছিল জাযীমা গোত্রের একটি সীমিত অংশের এবং নির্দিষ্ট কিছু বন্দির সাথে। এমনটি নয় যে, শুধুমাত্র 'সাবানা' বলার কারণে সকল বন্দিকে হত্যা করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এরা ইসলাম গ্রহণ করে নি, আর পূর্ববর্তী প্রতিশোধের ভয় ও আতঙ্ক তাদের মনে এতটাই প্রকট ছিল যে, তারা আত্মরক্ষার জন্য লড়াই শুরু করে। তারা হযরত খালিদের বাহিনীতে থাকা সুলাইম বিন মনসুর এবং মুদলিজ বিন মুররা গোত্রের কিছু লোকের ব্যাপারে প্রতিশোধ নেবার আশঙ্কা করছিল, আর সুলাইম গোত্রের লোকেরাই তাদের বন্দিদের রাতের বেলা হত্যা করে নিজেদের প্রতিশোধ নিয়েছিল। মুহাজিরীন ও আনসারের কেউ নিজ বন্দিদের হত্যা করেন নি, বরং তাদের মুক্ত করে দিয়ে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ এবং তাঁর (সা.) উত্তম আদর্শের ওপর আমল করেন।

হযরত ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব বুখারীর ব্যাখ্যায় গভীর এবং জ্ঞানগর্ভ নোট সংযোজন করেছেন; তিনি লেখেন, এটি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের (রা.) কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। এটি তার পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্তগত ভুল ছিল এবং তিনি তাড়াহুড়ো করে তিনি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর পরবর্তীতে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেনাপতি হিসেবে এর দায় তারই ওপর বর্তায়। এ কারণে মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-র ওপর অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট নিজের দায়মুক্ততাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন পুরো ঘটনা তদন্ত করান তখন এটিই প্রমাণ হয়, কোনো ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই মহানবী (সা.) কিসাসের (তথা প্রতিশোধের) পরিবর্তে রক্তপণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের (রা.) অনুরোধ এবং ভুল স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনার পর মহানবী (সা.) তাকে শুধু ক্ষমাই করেন নি; [এই কথা বলা যে, তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, বদদোয়া দিয়েছিলেন, ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন– এমন নয়। শাহ সাহেব লেখেন, তিনি (সা.) তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন;] বরং কয়েক দিনের মধ্যেই হুনাইনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী দল ও অশ্বারোহী দলের সেনাপতি হিসাবেও হযরত খালিদকে নিযুক্ত করেছিলেন। যদি অসন্তুষ্টি এত বেশিই হতো, তাহলে অন্য আরেকটি দলের নেতা নিযুক্ত করতেন না। কিন্তু তিনি (সা.) তাকে নেতা নিযুক্ত করেছিলেন।

এছাড়াও আরো দুটি সারিয়্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।

সারিয়্যা ইয়ালামলাম: মহানবী (সা.) হযরত হিশাম বিন আসের নেতৃত্বে দু–শো সদস্যের একটি দল মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ইয়ালামলামের দিকে প্রেরণ করেছিলেন, যা মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি দুই রাতের দূরত্বে অবস্থিত।

সারিয়্যা উরানা: এটি আরাফাতের সামনে অবস্থিত একটি উপত্যকা। বর্ণনা করা হয় যে, মহানবী (সা.) হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আসকে তিনশ সদস্যের একটি বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করে সেদিকে প্রেরণ করেছিলেন। তবে এই দুটি সারিয়্যার বর্ণনা মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদী করেছেন, অন্য কোনো প্রসিদ্ধ সীরাত প্রণেতা এটি উল্লেখ করেন নি। তাই এটি সঠিক কিনা– তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে; আর এ সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যায় না। তবে একজন সীরাত প্রণেতা লিখেছেন, আমাদের জানামতে কোনো ইতিহাসবিদ

এই সামরিক দলের কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা করেন নি, উরানা পর্যন্ত যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খালিদ বিন সাঈদ বিন আস। তবে এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, তাকে হুযাইল গোত্রের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল, যারা উরানাতে বসবাস করত।

যাহাক, এসব ঘটনা থেকে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কেও স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি কোথাও কঠোরতা প্রদর্শন করেন নি। আর এই অপবাদ যা ইসলামের শত্রুরা উপস্থাপন করে থাকে যে, তিনি যুদ্ধে হত্যা করাতেন– তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বরং যেখানে ভুলবশতও কিছু ঘটে গেছে, সেখানেও তিনি চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর অবশিষ্ট গাযওয়া ও সারিয়্যার বর্ণনা পরবর্তীতে করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)